শিল্প বিপ্লব

ইউনিট ১

ভূমিকা

আঠারো শতকের শেষদিকে এসে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় সাধারণভাবে তা শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। ১৮৩৭ সালে শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি সমাজতান্ত্রিক লেখক জেরোমি ব্লাংকি। তবে এটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালের দিকে। তখন ইংরেজ বিখ্যাত ইতিহাস গবেষক আর্নল্ড জে. টয়েনবি অক্সফোর্ডে দেয়া তাঁর বক্তৃতামালায় এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। এ বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশটির সমৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শিল্প বিপ্লব বিশ্বের নানা দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প বিপ্লবের বিষয়টি নানা দিক থেকেও আলোচিত হয়েছে। এ বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ্যে কি ঘটেছিল, কেন ফ্রান্সের পরিবর্তে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয় প্রভৃতি প্রশ্নে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পটভূমি, কারণ, বিকাশ ও শিল্প বিপ্লবোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে এ ইউনিটের তিনটি পাঠে আলোচিত হয়েছে।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ-১.১ **শিল্প বিপ্লবের পটভূমি**

পাঠ-১.২ **শিল্প বিপ্লবের কারণ**

পাঠ-১.৩ **শিল্প বিপ্লবের ফলাফল**

পাঠ-১.১ শিল্প বিপ্লবের পটভূমি

আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। এ সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় একটি স্থবির বা অনগ্রসর সমাজে শিল্প বিপ্লব হঠাৎ করে শুরু হয় নি, দীর্ঘকাল আগে থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি চলছিল। এক্ষেত্রে বিপ্লবের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে। এর পাশাপাশি কি কি কারণে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোর আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করতে হবে।

রাজনৈতিক পটভূমি

১৪৮৫ সালে টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তম হেনরি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। এভাবে টিউডর রাজবংশের যে শাসন শুরু হয় তা স্থায়ী হয়েছিল ১৬০৩ সাল পর্যন্ত। টিউটর রাজবংশের শাসনকাল থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে এ জন্যে যে এখান থেকে ইংল্যান্ডে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। টিউডর শাসনকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এ সময়ে দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টিউডর রাজাগণ অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের দমন, নতুন নতুন কার্যকরী সংগঠন ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় প্রতিষ্ঠা, শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনুগতএবং বিশ্বস্তলোক নিয়োগ, স্থানীয় শাসন ব্যাপারে অধিকতর কর্তৃত্ব আরোপ এবং সর্বোপরি পার্লামেন্টের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের শক্তিশালী শাসন প্রজাপীড়ন বা জনমতের বিরুদ্ধাচারণ করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, শক্তিশালী শাসন গড়ে উঠেছিল সমগ্র জাতির সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ টিউডরদের শক্তিশালী শাসনের পেছনে জনসমর্থন ছিল।

শক্তিশালী রাজতন্ত্র

টিউডর রাজত্বকালে শুধু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে রোমের পোপের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। অষ্টম হেনরির শাসনকাল থেকে পরবর্তী রাজাদেরকে ইংল্যান্ডের গির্জা ও রাষ্ট্র উভয়ের প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এভাবে ইংল্যান্ড বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তুএর ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়; কেননা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে যে এ্যাংলিকান চার্চ (Anglican Church) প্রতিষ্ঠিত হয় তা একদিকে চরমপন্থী প্রোটেস্টান্ট বা পিউরিটান ও অপরদিকে ক্যাথলিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। অর্থাৎ এ্যাংলিকান চার্চের প্রধান রাজাকে ক্যাথলিক ও পিউরিটানদের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্র

টিউডর যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের (Renaissance) সূত্রপাত।ফলে এ যুগে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বিশেষত এলিজাবেথের রাজত্বকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের যুগছিল। এ যুগেইংরেজি সাহিত্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শেক্সপিয়ের এ যুগেই তাঁর অমর লেখনী চালনা করেন। এ যুগে দর্শন চর্চারও প্রসার ঘটে। বেকন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩ সালে প্রথম জেমসের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের শাসন শুরু হয়। রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্টুয়ার্ট শাসনকগণ বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা বিধিদত্ত ক্ষমতার (Divine Right) বলে রাজা। সুতরাং তাঁদের কার্যাবলির জন্যে তাঁরা জনগণের কাছে নয় একমাত্র সৃষ্টিকর্তারকাছে দায়ী। পার্লামেন্ট রাজার এরূপ সীমাহীন ক্ষমতার দাবি মানতে সম্মত ছিল না। পার্লামেন্ট মনে করতো যে রাজক্ষমতা ব্যক্তিগত বা দৈব অধিকার ক্ষমতার ভিত্তি বা মূল উৎস সম্পর্কে রাজা ও পার্লামেন্টের দৃষ্টিভংগীছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব স্টুয়ার্ট শাসন আমলের শুরু থেকেই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ।

ঐশ্বরিক রাজাধিকারে বিশ্বাস

১৬২৯-৪০ সাল পর্যন্ত প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত শাসন, দীর্ঘ পার্লামেন্টের অধিবেশন, সাত বছর (১৬৪২-৪৯) স্থায়ী গৃহযুদ্ধ, প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড, রাজতন্ত্র ও লর্ড সভার উচ্ছেদ এবং ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডকে প্রজাতন্ত্র

ঘোষণা এবং ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন আরোহণের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পুন:প্রতিষ্ঠা। পুনপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সঙ্গে আবার বিরোধ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে এ বিরোধের অবসান হয়। পার্লামেন্ট শর্তাধীনে উইলিয়াম এবং মেরিকে সিংহাসন দান করে। ফলে স্টুয়ার্ট ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে রাজবংশের অবসান এবং জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লব পরবর্তী বিল অব রাইটস, মিউটিনি এ্যাক্ট, ট্রিনিয়াল এ্যাক্ট প্রভৃতি আইন পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইংল্যান্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে টলারেশন এ্যাক্টের মাধ্যমে ধর্মীয় সহনশীলতা নীতি স্বীকৃতি পায়।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের একত্রীকরণ

১৫৩৬ সালে ওয়েলস ইংল্যাণ্ডের সংগে যুক্ত হয়েছিল। অতপর এলিজাবেথের রাজত্বকালের শেষদিকে আয়ারল্যান্ডের বিজয় সমাপ্ত হয়। এবার ১৬০৩ সালে স্কটল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহন করার ফলে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একই রাজার শাসনাধীনে আসে। শেষ পর্যন্ত ১৭০৭ সালে এ্যাক্ট অব ইউনিয়নের মাধ্যমে দুটো দেশকে একই পার্লামেন্টের শাসনাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এ আইনে আরও স্থির হয় যে এখন থেকে দেশ দুটো গ্রেট ব্রিটেন নামে পরিচিত হবে। স্টুয়ার্ট যুগে ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়।

বৈজ্ঞানিক কারণ

শিল্প বিপ্লবপূর্ব ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার লক্ষ করা যায়। নিউটন, হার্ভি ও নেপিয়ারের পাশাপাশি আরও অনেক বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা ইংল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে ভূমিকা রেখেছিলেন। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে বিখ্যাত রয়াল সোসাইটি নামক বিজ্ঞান সভা স্থাপিত হয় (১৬৬২)। স্টুয়ার্ট যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন জন লক। টিউডর যুগে সাহিত্যে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল স্টুয়ার্ট শাসন আমলে তা অব্যাহত থাকে। মিলটন, ড্রাইডেন, জন বানিয়ান এবং পোপ ছিলেন এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এ যুগে গদ্য সাহিত্যেরও প্রসার ঘটে। স্টুয়ার্ট শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাময়িকী সাহিত্যের উদ্ভব।

আর্থ-সামাজিক পটভূমি

শিল্প বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক পটভূমি স্বভাবতই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসংগে যেসব বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে উপনিবেশ স্থাপন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, শিল্প-কৃষি-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি, বণিক পুঁজিরবিকাশ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি। স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে উপনিবেশ স্থাপন এবং তৎসংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ শুরু হয়। প্রথম জেমসের শাসন আমলে ইংল্যান্ডের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস টাউনে বা ভার্জিনিয়ায়। পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং ১৭৩৩ সালের মধ্যে ১৩ টি উপনিবেশ গড়ে উঠে।

ইংল্যান্ড ত্যাগ করে যারা উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে তাদের অধিকাংশই ছিল পিউরিটান। একই সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বোডাস, বার্মুডা এবং জ্যামাইকা দ্বীপে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে উঠে। অপর দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজটি স্বভাবতই খুবসহজ ছিল না, কেননা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও একই লক্ষ্য স্থির করেছিল।

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে উত্তর আমেরিকায় ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে। ইতোমধ্যে পলাশী যুদ্ধে বাংলার নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এভাবে পনেরো, ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপে যে বাণিজ্য-বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ফলে সব চেয়ে বেশি লাভবান হয় ইংল্যান্ড। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের রপ্তানি দ্বিগুণের বেশি এবং ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, কিন্ত আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল সব সময়ই বেশি।

ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের এ ধরনের সম্প্রসারণের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কেননা এর ফলে কয়লা, ইস্পাত, বাসন-পত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণ এবং বিশেষভাবে বয়ন-শিল্পে অগ্রগতি সাধিত হয়, আবাদি জমি

বৃদ্ধিপায়, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়, বণিক পুঁজি বিকাশ লাভ করে, সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান শক্তিশালী হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিতহয়। একই সংগে আধুনিকব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং ১৬৯৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, ১৬৯৮ সালে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম শুরু হয় এবং কয়েকটি বীমা কোম্পানি গঠিত হয়।

বয়ন শিল্পে তিনটি পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, Putting-out প্রথার উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে বস্ত্র উৎপাদিত হতো তাঁতীদের ঘরে। তাঁতী কাঁচামাল সংগ্রহ করে বস্ত্র উৎপাদন করতো এবং সরাসরি তা বাজারজাত করতো। কিন্তু আধুনিকযুগের শুরুতে ব্যবসায়ীগণ তাঁতীদের কাছে কাঁচামাল সরবরাহ করে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে তাঁতীতার স্বাধীনতা হারায় এবং বণিক পুঁজিশিল্প পুঁজিতেরূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিগণ তাঁতীদেরকে নিজ বাড়িতে উৎপাদন করতে না দিয়ে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করে। তাঁতীদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে উৎপাদন কাজ তদারকি করার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা দেখা গিয়েছিল প্রধানত তা দূরকরার জন্যেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এ ব্যবস্থা ছিল শিল্প বিপ্লবের সৃষ্ট কারখানা বা ফ্যাক্টরির পূর্বসূরী।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল ফ্লাইয়িং শাটল (Flying Shuttle) নামক এক ধরনের বৈজ্ঞানিক মাকুর প্রবর্তন। এটি ১৭৩৩ সালে জন কে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এটি যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হতো। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৬৬০ থেকে ১৭২৯ সালের মধ্যে মোট ২৭০ টি উৎপাদন কৌশল সরকারি অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল।

প্রসংগক্রমে অপর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা যায়। ইংল্যান্ডের সরকার সে যুগে প্রচলিত বণিকবাদ নীতি অনুসরণকরে উপনিবেশ স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, উপনিবেশগুলোর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য অনেক উপায়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে নেভিগেশন এ্যাক্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। প্রথম নেভিগেশন এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় ১৬৫১ সালে, ওলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালে। এ আইনে বলা হয় যে, উত্তর আমেরিকায় ও অন্যান্য এলাকার উপনিবেশ এবং ভারত থেকে যেসব পণ্য ইংল্যান্ডে আমদানি করা হবে তা শুধু ব্রিটিশ বাণিজ্য তরীতে বহন করতে হবে। দ্বিতীয় আইনটি প্রবর্তিত হয় ১৬৬০ সালে। এ আইনে বলা হয় যে উপনিবেশ সমূহ কত সংখ্যক পণ্য শুধুইংল্যান্ডে রপ্তানি করতে পারবে। একই সংগে উত্তর আমেরিকায় কতগুলো শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং ভারত থেকে কয়েক প্রকার সুতী বস্ত্রের আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই শেষোক্ত ব্যবস্থা দুটো গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে ১৪৮৫ সালের পরে তিনশত বছরের কম সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক, চিন্তা-চেতনা এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় যা শিল্পবিপ্লবকে প্রণোদিত করেছিল। ইংল্যাণ্ডকে সেই সময় বলা হত "পৃথিবীর কারখানা" ঐতিহাসিক প্লাম্ব বলেছেন, মানবজাতির অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে নব্যপ্রস্তর যুগের পর এতবড় পরিবর্তন আর ঘটেনি।

পাঠ-১.২ শিল্প বিপ্লবের কারণ

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এ বিপ্লবের পেছনে বেশ কিছু সামাজিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ ছিল। সামাজিক কারণগুলো মূলত এই বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছিল। অন্যদিকে অন্যকারণগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে। নিচে কারণগুলো আলোচনা করা হচ্ছে–

মূলধনের প্রসার

শিল্প স্থাপনের জন্যে মূলধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বণিক পুঁজির বিকাশ লাভ করে। এ ছাড়া উন্নত প্রথায় কৃষি খামার পরিচালিত হওয়ায় এক শ্রেণীর ভূ-স্বামী অর্থশালী হয়। একই সংগে উন্নতর অর্থনৈতিক সংগঠনের (যেমন ব্যাংক ও স্টক এক্সচেঞ্জ) উদ্ভব জনগণের সঞ্চয়কে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি মুনাফার হার বৃদ্ধির ফলে উঠতি শিল্পপতিদের হাতে নতুন ভাবে বিনিয়োগ যোগ্য অর্থের সমাগম হয়।

ক্রমবর্ধমান পণ্য চাহিদা

আঠার শতকের শেষভাগে শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রধানত তিনটি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম, কিন্তু অত:পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়তে থাকে। এটি সম্ভব হয়েছিল জন্মের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে। ১৭৫১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬.১ মিলিয়ন, ১৮৩১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪.২ মিলিয়নে। বর্ধিত চাহিদা একই সময় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপাওয়ায় তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধিপায়। উপরোক্ত দুটি কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশেও উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। বর্ধিত চাহিদা শিল্প বিপ্লবের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং কয়লা ইঞ্জিনের ব্যবহার

প্রযুক্তির উন্নয়ন শিল্প বিপ্লবের অপর একটি বড় কারণ। বাষ্প চালিত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে উঠে এবং শিল্পোৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। একথা বিশেষভাবে বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে সত্য। গুডইয়ার, ফ্যারাডে ও এরিকসনের মত বিজ্ঞানীর আবিষ্কারে শিল্পে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। কয়লা ও ইস্পাতের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নতুন যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরিতে ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। স্পিনিং জেনি ও যান্ত্রিক মাকু, ওয়াটার ফ্রেম, মিউল মেশিন, পাওয়ার লুম, স্টিম ইঞ্জিন প্রভৃতির কথা না বললেই নয়। অন্যদিকে যাতায়াত ও পরিবহন খাতের উন্নয়ন এই বিপ্লবকে প্রণোদিত করেছিল।

প্রাকৃতিক প্রভাব

ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিকও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্প বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। দেশের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া বয়ন শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করেছিল, কেননা এর ফলে বয়নের ক্ষেত্রে সুতা ছিঁড়ে যেতো না। মাটির নীচে কয়লা ও লোহার অফুরন্ত সঞ্চয় এবং কয়লা ও লৌহ খনিগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ায় এগুলোর আহরণ সহজ হয়েছিল। দেশের খালগুলি বিভিন্ন নদ-নদীকে যুক্ত করায় জলপথের উন্নয়ন সহজ হয়েছিল।

বিচ্ছিন্ন কারণ

অনেক ইতিহাস গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীর ধারণা ইংল্যান্ডে বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পিউরিটান বিপ্লব, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব, মুক্তপরিবেশে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অবাধ নীতি অনুসরণ শিল্প বিপ্লবের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকরেছিল।

কৃষি বিপ্লবের প্রভাব

অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন কৃষি বিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের পূর্বশর্ত। অর্থাৎ কৃষিবিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। কেননা এ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিপায় এবং শ্রমিক হিসেবে কারখানায় নিয়োগের জন্য জনশক্তির অভাব না থাকায় দুইটি খাতের উন্নয়ন সমান্তরালে চলতে থাকে।

পাঠ-১.৩ শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল হয়েছিল ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। ব্যাপক হয়েছিল এই অর্থে যে, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈদেশিক সম্পর্কে, মানুষে জীবন এবং চিন্তা-চেতনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্প বিপ্লবের এ প্রভাব ইংল্যান্ড তথা পৃথিবীরঅন্যান্য দেশে এখনও ক্রিয়াশীল রয়েছে। সে অর্থে এ প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। প্রভাবগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

অর্থনৈতিক প্রভাব

কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে আগের তুলনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিপায়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের হাতে যে পরিসংখ্যান রয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন বার্ষিক শতকরা চার ভাগেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান শতকরা ২৩.৪ ভাগ থেকে ৩৬.৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কৃষিখাতের উৎপাদনের অবদান শতকরা ৩২.৫ ভাগ থেকে কমে শতকরা ২২ ভাগে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে শিল্পখাতে নিয়োজিত জনসংখ্যা উক্ত সময়ে যখন শতকরা ৩০ ভাগ থেকে ৪৩ ভাগে বৃদ্ধিপায় কৃষিকাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা শতকরা ৩৬ ভাগ থেকে ২২ ভাগে নেমে আসে। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্প প্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়। সংগে সংগে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিপায়। ১৭৬০ ও ১৮৫০ সালের মধ্যে আমদানি বৃদ্ধিপায় ১২ গুণ, আর রপ্তানি বৃদ্ধিপায় ১৩ গুণ। আমদানী হতো কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য, আর রপ্তানি হতো শিল্পজাত পণ্য। ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য পৃথিবীর সব দেশে রপ্তানি হতো এবং এজন্য ইংরেজদের বলা হতো দোকানদার জাতি। একই সংগে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এভাবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এর প্রধানতম প্রমাণ হলো মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি। এক কথা আয়ের বন্টনের ক্ষেত্রে দারুণ বৈষম্যের সৃষ্টিহয়; কিন্তু মাথাপিছু আয় যে বৃদ্ধিপেয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে ইংল্যান্ডের কৃষিখাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলছিল।

পুঁজিবাদের উদ্ভব

ব্যপক শিল্পায়ন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। এই ব্যবস্থায় যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তা সংগৃহীত হয় পুঁজিপতি কর্তৃক। এভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সবটায় পুঁজিপতিদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত পণ্য দেশে-বিদেশে বিক্রি করে তারা লাভবান হয় এবং এভাবে সঞ্চিত মূলধনদ্বারা আরও নতুন শিল্প গড়ে তোলে। একই সংগে নতুন পুঁজিপতিরা কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসে। এভাবে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় কারখানা গড়ে উঠে এবং এসব কারখানায় গ্রাম থেকে আগত বিপুলসংখ্যক মানুষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয়। ফলে দেশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব শহরের মধ্যে ম্যানচেস্টারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ শহরটি ছিল বয়নশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। এভাবে দেশের মোট জনসংখ্যায় শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেড়ে যায়। এক হিসেব মতে আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ শহরে বসবাস করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধিপেয়ে ১৮০১ এবং ১৮৪১ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ ও ৬০ ভাগে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা দ্রুত কমে যায়, কোনো কোনো এলাকা প্রায় জনশূন্যহয়ে পড়ে।

সামাজিক প্রভাব

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতোপূর্বে সমাজে বুর্জোয়াবা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবার শিল্প বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেননা ধনী ব্যবসায়ী এবং উঠতি শিল্পপতিদের প্রায় সবাই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীভূক্ত। অভিজাত শ্রেণী এতদিন যে ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল তা লোপ পায় নি সত্য, কিন্তু আগের তুলনায়তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে। ইংল্যান্ডে অনুরূপঘটনা ঘটেছিল শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে।

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব শিল্প বিপ্লবের অন্যতম একটি দিক। নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠলে গ্রাম ছেড়ে অনেকে শহরে এসে শ্রমিক হিসেবে জীবনযাত্রা শুরু করে। এভাবে ভূমিহীন, চাকুরি-সম্বল শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করে কম মজুরিতে জীবিকা নির্বাহ করতো। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে একার উপার্জনে সংসার চলতো না বলে নারী ও শিশুদেরকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হতো। কারখানাগুলো নোংরা, অস্বাস্থ্যকর এবং যন্ত্রপাতিগুলো এমনভাবে রাখা হতো যে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। এ অবস্থায় শিশু ও নারী শ্রমিকদের ১৬-১৭ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হতো। শ্রমিকদের বাসস্থানও ছিল একইভাবে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বলা যেতে পারে তারা বস্তিতে বসবাস করতো। শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশারকথা সমকালীন অনেক লেখায়, এমনকি সরকারি প্রতিবেদনেও পাওয়া যায়। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন ধনী পুঁজিপতিও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয় অপর দিকে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণী ও গড়ে উঠে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা সমাজে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য এবং শ্রমিকদের দারিদ্র্যের কথা ভেবে এর প্রতিকারের চিন্তা করেন। তাঁরা এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, শ্রমই হলো সম্পদের উৎস, আর কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। শ্রমিক কাঁচামালকে ভিত্তি করে তার শ্রমের দ্বারা যা উৎপাদন করে তার মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারখানার মালিক প্রকৃতপক্ষে মুনাফার দাবিদার হতে পারে না। রাষ্ট্রের উচিত শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এভাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিকাশ ঘটে, আর এ মতবাদের প্রধান তাত্ত্বিক প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস।

রাজনৈতিক প্রভাব

শিল্প বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এক্ষেত্রে অনেকগুলো দিক শনাক্ত করা যায় যার দ্বারা বিশেষে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। **প্রথমত**, রাজনৈতিক অঙ্গনেও শিল্প বিপ্লবের গুরুত্ব ও প্রভাব অনুভূতহয়। শিল্পপতি ও বণিকদের যে শ্রেণী শক্তিশালী হয় তার ফলে ভূস্বামীও হুইগ রাজনীতিকদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। **দ্বিতীয়ত**, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং ফলে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন শুরু হয়। একই লক্ষ্যে শ্রমিক দল গঠিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে মালিকের নিকট তাদের দাবি পেশ করে। ফলে নিম্নতম মজুরী, কর্মক্ষেত্রে শ্রম ঘন্টা, বাসস্থান, বীমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। এক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করে। **তৃতীয়ত**, শিল্প বিপ্লবের ফলে পার্লামেন্টের সংস্কারের আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ এর ফলে অনেক নতুন শহর গড়ে উঠে এবং অনেক পুরাতন শহর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতে জনসংখ্যার ঘনত্বে ব্যাপক রদবদল হয় এবং এজন্যে পার্লামেন্টের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। **চতুর্থত**, বেশি মুনাফারলোভে শিল্পপতিরা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি পণ্য উৎপাদন করে। এ বাড়তি পণ্য বিক্রির জন্যে বিদেশে বাজার দখলের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিল্প বিপ্লবের আগেই ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এবার সে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ইরোপের অন্যান্য দেশেও শীঘ্রই শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল।

সারাংশ

অনেক বিশ্লেষক শিল্পবিপ্লবের কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের মতে অর্থনৈতিক কারণগুলো অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অনেকে চাহিদা বৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি সঞ্চয় বৃদ্ধির কারণে মূলধনের প্রাচুর্য এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি শিল্প বিপ্লবের পথ করে দেয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সবগুলো কারণ ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে মিলে যাওয়ায় সেখানেই ঘটেছিল শিল্প বিপ্লব।